একশো বারো

সায়ন্তনী পূততুন্ড

আলিপুর জেলের জেলার স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেপে নিয়েছিলেন ঋতিকাকে। তারপর একটু থেমে বললেন, "কি দরকার একশো বারো-র সঙ্গে?"

ঋতিকা ওর প্রেসকার্ড দেখিয়েছিল। নীলের দেওয়া চিঠিটাও গুঁজে দিয়েছিল জেলারের হাতে।

"অ!" স্বরবর্ণটা উচ্চারণ করে দু'টো জিনিসই ফেরত দিয়ে বললেন তিনি, "বুঝলাম। স্টোরি তৈরি করবেন! চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু মনে হয় না হবে।"

প্রথমদিনই এমন হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিল ঋতিকা। তার বিরক্তি লক্ষ্য করে জেলার হাসলেন, "ম্যাডাম, এর আগেও অনেক রিপোর্টার এসেছে। যত তাড়াতাড়ি এসেছে, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছে। আপনি হচ্ছেন সাত নম্বর!"

এই জন্যেই পুলিশের সঙ্গ ভাল লাগে না। কয়েদিদের নম্বর গুনতে গুনতে ওরা ভীষণভাবে নম্বরসর্বস্ব হয়ে যায়। যেমন বিদিশা সেন নামের ভদ্রমহিলা ওদের কাছে একশো বারো নম্বর কয়েদি, তেমনি ঋতিকাও সাত নম্বর রিপোর্টার। কে জানে! এরা বোধহয় প্রেমিক প্রেমিকাকেও নম্বর দিয়ে চেনে! নীল একবার বলেছিল, ঋতিকা নাকি তার ছয় নম্বর প্রেমিকা! হয়তো তার ফোন নম্বরটাও সেভ করেছে 'ছয় নম্বর' বলে! ভাগ্যিস দেশের সংবিধানের কৃপায় স্ত্রী বা স্বামী এখনও পর্যন্ত এক নম্বরই হতে পারে! তাই ওখানে নম্বরের ফান্ডা মারার উপায় বিশেষ নেই!

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে, "কেন? মেয়েটি কি ভায়োলেন্ট?"

"একদম নয়!" জেলার হেসে বললেন, "বরং উলটোটাই। কিন্তু স্টোরি লিখতে গেলে তো প্রথম কমিউনিকেশনের প্রয়োজন।"

"অফকোর্স। আমি তো ওর সঙ্গে কথা বলতেই চাই।"

"কার সঙ্গে কথা বলবেন! সে তো কথাই বলে না!" বলতে বলতেই জেলারের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, "স্রেফ থেকে থেকে কবিতা আওড়ায়।"

"কবিতা!" ঋতিকা কৌতূহলী, "কি কবিতা? কার লেখা?"

"কার লেখা জানি না।" তিনি বিরক্ত মুখেই জানান, "কিন্তু যখনই আমি রাউন্ড দিতে যাই, আমায় দেখে হাসে। আর বিড়বিড় করে নিজের নম্বরটা দেখিয়ে বলে, 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো!' এখনও পর্যন্ত চুরাশিবার শুনেছি কবিতাটা! তাই মুখস্থ হয়ে গেছে।"

ফের ফ্যাক্টের মধ্যে নিউমেরোলজি ঢুকে পড়েছে দেখে হেসে ফেলল সে। তার হাসি দেখে জেলার আরও বিরক্ত হলেন, "হাসির কথা নয় ম্যাডাম! যতবার কবিতাটা শুনি, গা জ্বলে যায়! কথার ছিরি দেখুন! 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো!' হুঃ!"

কোনওক্রমে হাসি চেপে প্রশ্ন করে ঋতিকা, "আমি কি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারেন। নীল যখন রেফার করে পাঠিয়েছে তখন অবশ্যই পারেন।" তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে এককুঁচি তির্যকদৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "কিন্তু স্রেফ কথা বলতেই পারবেন। ওই পর্যন্তই। শুনতে কিছুই পাবেন না! ও বেশি কথা বলে না। বড়জোর কবিতা-টবিতা বলতে পারে।

তার বেশি কিছু বলবে না।"
"আরও কোনও কবিতা বলে বুঝি?"
জেলার মুখ খোলার আগেই এক মহিলা কনস্টেবল বলে উঠল, "হ্যাঁ ম্যাডাম। যখনই আমি খাবার দিতে যাই তখনই বলে, 'পুলিশ,ও-রে পুলিশ, কবির কাছে আসার আগে টুপিটা তোর খুলিস!' বলুন তো ম্যাডাম। আমি কি টুপি পরি? না উনি কোনও কবি?"
ঋতিকা আবার হাসি চাপল। একশো বারো নম্বর কয়েদির সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। অথচ তার বর্ণনা শুনেই সে রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।
মহিলার সেন্স অব হিউমার মারাত্মক! তার সঙ্গে জেদও অবশ্য কম নয়!
কিছুদিন ধরেই মহিলা কয়েদিদের ইতিহাস নিয়ে একটা স্টোরি করার কথা ভাবছিল সে। তখনই নীলের কাছ থেকে এই লিডটা পেয়েছিল। নীল কয়েদি নম্বর একশো বারো, তথা বিদিশা সেন-এর কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, "আশ্চর্য মহিলা! তার থেকেও বেশি আশ্চর্য তার জেদ!

তবে শেষপর্যন্ত এমন কেন হল? কেন সেই মমতাময়ী, সুখী নারীই এমন নৃশংস হয়ে উঠলেন?

একদিকে পাবলিক প্রসিকিউটার হাঁউ মাউ খাঁউ করে তার চরিত্র নিয়ে টানাটানি করছে! অন্যদিকে ডিফেন্স কাউন্সিল প্রাণপণ চেষ্টা করেছে খুনটাকে 'সেলফ ডিফেন্সের জন্য অনিচ্ছাকৃত মার্ডার' হিসেবে প্রমাণ করার! সে মহিলার স্বামীর চরিত্রে কাদা ছিটিয়ে একসা করছে!
মাঝখানে এই মহিলা! তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল—এই চূড়ান্ত নোংরামির মধ্যে তিনি নেই! কোর্ট রুম থেকে বহুদূরে কোথাও রয়েছেন। দুই উকিলের চেঁচামেচি তার কানেও ঢুকছে না! পাবলিক প্রসিকিউটারের অভিযোগের উত্তরে খুব ঠান্ডা ভাবে জানালেন যে স্বামী ছাড়া তার জীবনে অন্য পুরুষের অস্তিত্ব ছিল না। এবং একই সঙ্গে জানালেন—তার স্বামীও আদৌ মদ্যপ, লম্পট ছিলেন না। জীবনে কোনওদিন তার গায়ে হাত তোলেননি ভদ্রলোক। তাই সেলফ ডিফেন্সের প্রশ্নই ওঠে না!" নীলের চোখে যেন মুহূর্তটা ভেসে উঠেছিল। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, "আশ্চর্য! ডিফেন্স কাউন্সিল যেভাবে কেসটাকে তুলে ধরেছিল, তাতে তার সুরে সুর মিলিয়ে গেলেই শাস্তি অনেক কম হত মহিলার। অন্তত যাবজ্জীবন শাস্তি হত না। মেয়েদের ব্যাপারে আইন চিরদিনই করুণাময়। আর সুন্দরী মহিলা হলে তো কথাই নেই! উকিল, জজসাহেব থেকে শুরু করে কোর্টরুমের প্রত্যেকটি মানুষের সহানুভূতি পেতে কয়েক সেকেন্ডও লাগত না ওর! কিন্তু মহিলা সহানুভূতি পাওয়ার কোনও চেষ্টাই করলেন না! পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে শুধু ঠান্ডা গলায় একই কথা বলে গেলেন, আমিই আমার স্বামীকে খুন করেছি। সে আমায় মারেনি, ধরেনি, কিচ্ছু করেনি! কিন্তু তবু ওকে আমি খুন করেছি। কেন করেছি, জানি না।"
ঋতিকা গালে হাত দিয়ে নীলের কথা শুনছিল। সে ক্রমাগতই কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল। অবাক হয়ে বলল, "অদ্ভুত তো!"
"আমার এত বছরের কেরিয়ারে আমি এমন কেস আর কখনও দেখিনি ঋতু।"
নীল অন্যমনস্কভাবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "এই কেসে কে খুন করেছে, এই প্রশ্নটা বড় ছিল না। কারণ খুনের অব্যবহিত পরেই ভদ্রমহিলা নিজেই মার্ডার ওয়েপন সহ আত্মসমর্পণ করেন। কোনও প্রমাণ লুকোনোর চেষ্টা করেননি। মিথ্যে গল্প ফাঁদার চেষ্টা করেননি। সব দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট ছিল, শুধু একটা বিষয় ছাড়া। কেন? কেন নিজের স্বামীকে খুন করেছিলেন মহিলা? নিজেই স্বীকার করেছেন যে তার স্বামী নিপাট ভদ্রলোক ছিলেন, মদ্যপ-লম্পট ছিলেন না, অত্যাচারী ছিলেন না। তবে কেন? কেন?"
শেষ প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করেছিল নীল। পরে ভদ্রমহিলার কেসটা নিয়ে দুই উকিল এবং বিচারকের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছে, একা নীল নয়, এই কেসের কথা তাঁরাও ভোলেননি! এবং একই প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁদেরও!
কেন? ... কেন?
এই প্রশ্নের হাত থেকে ছাড়া পায়নি ঋতিকা নিজেও। বিদিশা সেনের জীবন-যাপন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরে প্রশ্নটা তার মস্তিকে আরও গেঁথে গিয়েছিল। বিদিশা সেন নিজে খুব বড় কেউকেটা কেউ নন। তবে তার স্বামী একজন কর্পোরেট কর্তা ছিলেন। টাকা-পয়সা, বিলাস-ব্যসনের কোনও অভাব ছিল না। বিদিশা হোমমেকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন। কবিতা লিখতে ভালবাসতেন। বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ির একচ্ছত্র মালকিন। সুদর্শন, সফল স্বামীর আদরের সুন্দরী বউ। একমাত্র ছেলে পড়াশোনায় তুখোড়। উচ্চ-মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছে। মেডিকালেও র‍্যাঙ্ক করা ছাত্র! মায়ের অনেক গর্বের ধন। এমন ঝকঝকে ঘর, তকতকে বর আর বকবকে সন্তানের স্বপ্ন সব মেয়েই দেখে। বিদিশার স্বপ্ন সফল হয়েছিল। জীবনের সব সুখ পেয়েছিলেন তিনি। সফল পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম, সুন্দর গোছানো সংসারের মালকিন, সফল সন্তানের জননী। সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ এক সুখী নারী!
তবে শেষপর্যন্ত এমন কেন হল? কেন সেই মমতাময়ী নারীই এমন নৃশংস হয়ে উঠলেন? কেন নিষ্ঠুরভাবে হাতুড়ির বাড়ি মেরে খুন করলেন নিজের স্বামীকে? কি এমন ঘটেছিল সেই রাতে?
অনেক ভেবেও উত্তর পায়নি ঋতিকা। নিজের ছোট্ট ডিভানটায় শুয়ে শুয়ে অনেক বার ভেবেছে বিদিশা সেনের কথা। বারবার মনে পড়ে গেছে নীলের কথাগুলো, "তবে কেন? কেন?"
শেষপর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিল, এই 'কেন'র উত্তর খুঁজে বের করবে। এই স্টোরিটা করবে। তার জন্য যতই কাঠখড় পোড়াতে হোক না কেন, এই রহস্য ভেদ করেই ছাড়বে ঋতিকা!
"ম্যাডামকে নিয়ে যাও।" জেলারের কণ্ঠস্বরে মুহূর্তের মধ্যে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল তার। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মহিলা কনস্টেবলের দিকে তাকিয়ে আদেশ করলেন জেলার, "নিয়ে যাও ওঁকে। কয়েদি নম্বর একশো বারো। বুঝেছ? আর পৌঁছে দিয়েই চলে এসো না। ম্যাডাম যদি পালিয়ে আসতে চান, তবে ওঁকে হেল্পও কোরও।"

২

একশো বারো! ওরফে বিদিশা সেন! ঋতিকার কৌতূহলী দৃষ্টি একঝলক মেপে নিল তাকে। অন্যান্য কয়েদির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষটির চরিত্রের অনমনীয়তার আভাস খানিকটা চোয়াল ছুঁয়ে গেছে। এছাড়া গোটা মুখ আশ্চর্য

রকমের কোমল! চোখ দু'টোয় নরম স্থিরতার আভাস। মুখের গড়নটা অবিকল কুমোরটুলির দুর্গাপ্রতিমার ছাঁচে গড়া! গায়ের রং দেখলে মনে হয় একটা সোনালি আলো বুঝি ভুল করে পিছলে পড়েছে! চুল অবিন্যস্ত। মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ আছে ঠিকই, কিন্তু চোখে একটা আশ্চর্য মুক্তির আনন্দ খেলা করে বেড়াচ্ছে। যেন এই বন্দিগৃহেও তিনি খুঁজে পেয়েছেন মুক্তির রাস্তা!

ঋতিকা অবাক হল! যেমন ভেঙে পড়া অবিন্যস্ত অথবা আলুলায়িত মূর্তি দেখবে ভেবেছিল, এ সম্পূর্ণ তার বিপরীত চিত্র!

আকস্মিকভাবে তার মনে হল, কোনও অনুতাপ নেই এ নারীর! নেই কোনও পাপবোধ। কে বলবে, এই মহিলাই এক রাতে হয়ে উঠেছিলেন অমন চরম নিষ্ঠুর!

বিদিশার ব্যক্তিত্বের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিল ঋতিকা। প্রথমেই কি বলবে বুঝতে পারেনি। তাই শেষপর্যন্ত মুখ খুললেন বিদিশা সেনই।

"আপনি কে? রিপোর্টার?"

অসম্ভব সুললিত কণ্ঠস্বর! মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে। স্বাভাবিকভাবে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বিদিশা বিরক্তিসূচক মুখ করেছেন, "আবার কেন? আমি তো বলেছি, কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলব না!"

ভদ্রমহিলার বিরক্তি দেখে মজা পেল ঋতিকা। সাংবাদিকের নামেই অ্যালার্জি আছে বিদিশার। এ তথ্যটা নীলই জানিয়েছে তাকে। সে মিষ্টি হেসে বলে, "সাংবাদিকের প্রতি এত বিরক্তি কেন? আমরা তো সতীন নই!"

বিদিশা ভাবলেশহীন মুখে জানালেন, "ব্যাড জোক। দুনিয়ায় একমাত্র সতীন সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা, একথা আপনাকে কে বলল? এখনকার মেয়েদের মুখে সতীন সম্পর্কে রসিকতা ভীষণ খেলো লাগে। ওসব উল্লুতে কথা আমাদের ঠাকুমা-দিদিমার মুখে মানাত। আপনার মুখে একটুও মানাচ্ছে না।"

প্রথমেই এমন একখানা বাউন্সার খেয়ে খানিকটা ব্যাকফুটে চলে গেল ঋতিকা। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এখানে খাপ খোলা খুব একটা সহজ নয়! মহিলা বেশ কঠিন ঠাঁই।

তবু সে একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে, "সাংবাদিকতা করার অপরাধে কি আমাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে? বসতে বলবেন না?"

বিদিশা মৃদু হাসলেন, "অতখানি অভদ্র এখনও হইনি। ওই খাটটার ওপর বসতে পারেন। চাইলে আপনাকে ডিনারের অফারও দিতে পারি। কিন্তু জেলের পোড়া রুটি বা লাপসি কি আপনার মুখে রুচবে?"

আরও একবার মনে মনে ভদ্রমহিলার সেন্স অব হিউমারের প্রশংসা করল ঋতিকা। তার অঙ্গুলিনির্দেশ মান্য করেই বসে পড়ল খাটটায়।

"কতক্ষণ বসবেন সেটা ঠিক করা আছে তো?" মহিলার মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি, "নয়তো আপনার জন্য আমার পোষ্যদের অসুবিধে হতে পারে। ওরা শুধু আমার সাহচর্যে অভ্যস্ত।"

"পোষ্য!" বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠে গেল তার। এই জেলের মধ্যে বন্দি মানুষটির পোষ্যও আছে! ভারতের কোনও আদালতে কয়েদির সঙ্গে পোষ্যদের রাখার অনুমতি দেওয়া হয় বলে তার জানা নেই! তবু একবার সে ক্ষুদ্রাকার সেলটার চতুর্দিকে তাকিয়ে নিল। বিদিশা সম্ভবত তার মনের কথা বুঝতে পেরে ফের হাসলেন—

"ওভাবে ওদের দেখা যাবে না। ওরা সহজে দেখা দেয় না।"

ঋতিকা বিস্ময়াভিভূত, "মানে? কাল্পনিক পোষ্য? না ইনভিজিবল পেট?"

"কোনওটাই নয়।" তিনি মিটমিট করে হাসলেন, "আসলে বিছানায় না শুয়ে পড়লে ওদের অস্তিত্ব ঠিক টের পাওয়া যায় না। ছারপোকারা সাদা চোখে ধরা দেয় না। সুযোগ পেলেই টুক করে কামড়ে দিয়ে কেটে পড়ে। অবশ্য আপনি চাইলে কয়েকটাকে জামাকাপড়ে করে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতেই পারেন। আপত্তি নেই!"

ছারপোকা! ঋতিকা প্রায় লম্ফ মেরে মেঝের উপরে নেমে বসল।

"আপনি দেখছি মাটির মানুষ। তবে ওখানেও সামলে।" তার চোখে কৌতুক নেচে উঠল, "আরশোলা, টিকটিকি তো আছেই। তার চেয়েও বড় বালাই ইঁদুর! মাঝে মধ্যে আমার গায়েও উঠে পড়ে। তবে কামড়ায় না। কোয়াইট ফ্রেন্ডলি ইঁদুর।"

ইঁদুর আবার ফ্রেন্ডলি! কোনওমতে নিজেকে গুটিয়ে সন্তর্পণে বসল

ঋতিকা। সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিল যে সাংবাদিকরা কেন এখানে এসেই পালিয়ে যায়। তার সঙ্গে অন্য একটা প্রশ্নও বারবার ঘাঁই মেরে যাচ্ছে মাথায়। অমন বিলাস ব্যসনে থাকা মহিলা এই ভয়াবহ পরিবেশে দিন গুজরান করছেন কি করে! যার দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার চাদরে একটা ভাঁজও থাকত না, তিনি এই ছারপোকাসর্বস্ব খাটটায় কি করে রাত্রিযাপন করেন! দামি মোগলাই বা কন্টিনেন্টাল ফুডে অভ্যস্ত মুখে জেলের লাপসি কি রোচে? এয়ার কন্ডিশনারের আরামদায়ক শীতলতা ছেড়ে এই দমবন্ধ করা পরিবেশে কি তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন না? অথচ মহিলাকে দেখে মনে হয় না যে, একরাতও তিনি না ঘুমিয়ে আছেন, অথবা কখনও অখাদ্য খাবারের প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

ঋতিকা বিদিশার চোখ দু'টোর দিকে তাকাল। নাঃ এত সহজে সে হাল ছাড়বে না। অনেকদিন বাদে এমন একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে সে। সহজে হার মানবে না।

বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথাবার্তা হল না। বিদিশার দৃষ্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ। ঋতিকা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। হিসেব মতো এখন তার প্রশ্ন করার কথা। কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছে না। কোথায় যেন বাধছে! সে ভাবছিল এবার কি করবে! কি করা উচিত! তার আগেই বিদিশা তাকিয়েছেন তার দিকে।

"তোমাকে তুমিই বলছি।" তিনি ধীরস্বরে বলেন, "বয়েসে বোধহয় ছোটই হবে। কত বয়েস তোমার?"

"পঁয়ত্রিশ!"

বিদিশার চোখ তার সিঁথি ছুঁয়ে গেল, "বিয়ে করেছ? না এখনও আনম্যারেড?"

"বিয়ে করিনি।"

"কেন? ইচ্ছে নেই? না সুযোগ হয়নি?"

ঋতিকা ঢোঁক গিলল। সচরাচর প্রশ্ন করাটা তারই কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা তো উলটে তারই ইন্টারভিউ নিচ্ছেন! সে কী জবাব দেবে ভেবে পেল না!

বিদিশা আপনমনেই বললেন, "আমিও অবশ্য একসময় ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব না। প্রেসিডেন্সি থেকে বাংলা সাহিত্যে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হওয়ার পরে ভেবেছিলাম বাংলা কবিতার আরাধনা করে বিপ্লবের সূচনা করব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। যখন আমি বিপ্লবী হওয়ার জন্য কলমে শান দিচ্ছি, ঠিক তখনই বাবার আদেশ এল। আর আমিও কলম-টলম ফেলে সুড়সুড় করে বসে পড়লাম ছাদনাতলায়। আমাদের সাহস ছিল না। তোমাদের আছে। কিন্তু...!"

"কিন্তু তাতে তো কোনও ক্ষতি হয়নি।"

ঋতিকা তার কথার মাঝখানেই কথা গুঁজে দিয়েছে, "বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে আপনি তো সুখীই ছিলেন!"

"ইয়েস, হ্যাপিলি ম্যারেড তকমাটা আমার গায়ে সেঁটে দিতেই পারো।"

"তবে?"

"তবে কী?"

"তবে... কেন...?"

যে প্রশ্নটা এতদিন ধরে মাথায় ঘুরছিল, সেই প্রশ্নটা করেই ফেলল সে। বিদিশা তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন, "কেন কি? কেন খুন করলাম? সেটাই জানতে চাইছ তো?"

ঋতিকা অস্বস্তিতে পড়ে। সে মহিলার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। চোখ নামিয়ে বলে, "অনেকের ধারণা যে আপনার স্বামী অত্যাচারী ছিলেন। তাই...!"

"ইশশশশ।" আফসোসসূচক শব্দ করলেন তিনি, "একদম নিরুপা রায়ের কনসেপ্ট। নয়? বেচারি সতী-সাধ্বী মেয়েমানুষটাকে রাক্ষসের মতো স্বামী রোজ পেটায়! মেয়েটা বাইশ বছর ধরে চুপ করে মার খেয়ে গেল। তারপর একরাতে তার উপর দেবী চন্ডী ত্রিশূল নিয়ে ভর করলেন। অমনি সেই নিরীহ মেয়েটা স্বামীর 'ঘচাং ফুঃ' করে ছেড়ে দিল!" বলতে বলতেই হেসে উঠেছেন, "খুব মজাদার ব্যাপার। তার মানে তুমি বলতে চাও, মানুষের চোখে আমি নিরুপা রায়। তাই না?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"তবে?"

"কেউ কেউ ভাবে যে আপনি অন্য কারওর দায় স্বেচ্ছায় ঘাড়ে টেনে নিয়েছেন...!"

ঋতিকাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বিদিশা বললেন, "ও, ইউ মিন শর্মিলা ঠাকুর অব 'আরাধনা'! বেচারি মেয়েটি নিজের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিল। তাই তো?"

সে আর কি বলবে! বুঝল, এখানে হঠকারিতা করাই চূড়ান্ত বোকামি। বিদিশার ব্যঙ্গাত্মক কথাগুলো তার গায়ে তিরের মতো এসে বিঁধছে।

"তোমার কী মনে হয়?" কৌতুকে ফের তার চোখ চকচক করে ওঠে, "আমি নিরুপা রায়? না শর্মিলা ঠাকুর?"

গলায় জোর এনে বলল ঋতিকা, "সেটা জানতেই তো এসেছি।"

বিদিশা তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে জরিপ করতে করতে বললেন, "সত্যিই কি তুমি জানো না? আমার তো মনে হয়—তুমি সব জানো। তাই না?"

ঋতিকার সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল। কোনওমতে ঢোঁক গিলে বলে, "কি জানব?"

"তোমার প্রশ্নের উত্তরটা জানো না?" বিদিশা বিড়বিড় করলেন, "হয় তুমি জানো। নয় এখনও জানার সময় আসেনি।"

ঋতিকা কিছু বোঝার আগেই
জেলার হেঁকে উঠলেন,
"ওঃ, অসহ্য! ম্যাডাম,
আপনার কাজ হয়েছে?"

"মানে?"

"মানে?" বলতে বলতেই আড়চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে সজোরে হেসে উঠলেন তিনি, "পু-লি-শ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো। বুঝলে?"

ঋতিকা কিছু বোঝার আগেই বাইরে থেকে জেলার হেঁকে উঠলেন, "ওঃ, অসহ্য! ম্যাডাম, আপনার কাজ হয়েছে?"

৩

নীল খুব মন দিয়ে ড্রাইভ করছিল। তার ডানহাতে ধরা ধূমায়িত সিগারেট। বড্ড সিগারেট খায় লোকটা। এক কথায় চেন স্মোকার। ঋতিকা নিজে স্মোক করে না। তবে সিগারেটের গন্ধটা তার খুব ভাল লাগে। বাবা খেতেন। তার গায়ের ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকত সিগারেটের আলতো তামাক পোড়ার গন্ধ। সচরাচর পুরুষ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা মেয়েরা বাবার কাছ থেকেই পায়। সেই অর্থে

সিগারেটের গন্ধটা ভীষণ পুরুষালি মনে হয় তার।

"ওদিকের কাজ কিছু হল?"

গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা করল নীল। ঋতিকা হতাশ ভাবে মাথা নাড়ে। সে এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে। প্রথমদিনের ওই অদ্ভুত ইন্টারভিউয়ের পরও হাল ছাড়েনি। তারপর আরও বেশ কয়েকবার দেখা করেছে বিদিশার সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য জেদি মহিলা। অন্য বিষয়ে কথা বলতে তার আপত্তি নেই। অথচ অমোঘ প্রশ্নটা করলেই নীরব হয়ে যান। অনুরোধ-উপরোধ করলে বিরক্ত হয়ে বলেন, "ওই নিরুপা রায়, অথবা শর্মিলা ঠাকুর মার্কা একটা গপ্পো বানিয়ে দাও না ভাই। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি।"

"কিন্তু সেটা তো সত্যি হবে না!" সে প্রতিবাদ করেছে, "পাঠকদের কি মিথ্যে খবর দিতে পারি?"

"আর সত্যিটা যদি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়?" তিনি স্মিত হাসলেন, "যদি হজম না করতে পারো?"

"সত্যি অবিশ্বাস্য হবে কেন?"

"হয়... হয়... জানতি পারো না।" বিদিশা বলেন, "এত জেদাজেদি যখন করছ, তখন না হয় বলব তোমাকে। দেখি কতটা বিশ্বাস করতে পারো।"

ঋতিকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। যাক, তবু ভদ্রমহিলা নিমরাজি হয়ে এসেছেন। এতদিন ধরে ছারপোকা, মশাদের নির্বিচারে রক্তদান করে আসছে সে। অবশেষে সেই একাগ্র তপস্যার ফল হয়তো অচিরেই মিলতে চলেছে।

কিন্তু কোথায় কি! পরের দিনই ডিগবাজি খেলেন মহিলা। প্রশ্নটা করতেই ফের নীরব হয়ে গেলেন। সেই নীরবতা কিছুতেই ভাঙা গেল না। শুধু চলে আসার সময়ে মুচকি হেসে বললেন, "অয়ি লাবণ্যপুঞ্জ/এখনও আমার সময় হয়নি/যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনি/সময় যখন আসিবে আপনি/যাইব তোমার কুঞ্জ।"

কেমন যেন হেঁয়ালিভরা কথাবার্তা! কখনও ঋতিকার মনে হয়, বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছে তাকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুভব করে যে তার ধারণা ভুল! যে মহিলাকে বাইশ বছর দেখেও তার স্বামী চিনতে পারেননি, চিনতে পারেনি তার একমাত্র সন্তান—তাকে চেনা কি এত সহজ!

"হবে, হবে।" নীল তাকে আশ্বাস দেয়, "তোমার ধৈর্য, সহ্য আছে। তুমি হচ্ছ সুনীল গাওস্কর। ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকতে পারো। ওই গুণেই আমায় বোল্ড আউট করেছ—তো বিদিশা সেন কি জিনিস?"

ঋতিকা একটু ফ্যাকাশে হাসল। নীল ড্রাইভ করতে করতেই তার দিকে আড়চোখে তাকাল। আস্তে আস্তে বলে, "আর আমাদের ব্যাপারটা কি হল ঋতু? তুমি বলেছিলে মাসিমার সঙ্গে কথা বলবে। কথা কিছু হল?"

সে হতাশ ভাবে মাথা ঝাঁকায়। নাঃ, মা-কে এখনও নীলের সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। মা এখন ঋতিকার বিয়ের ব্যাপারে কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত নন। কী-ই বা বলবে মা-কে? নীলকেই বা কী বোঝাবে? ওকে কি বলা যায় যে সংসারের অবস্থা এখনও খুব সুস্থির নয়! বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। সংসারে বড় মেয়ে হিসাবে ঋতিকা গত দশ বছর ধরে সাংবাদিকের চাকরি নিয়ে খানিকটা হাল ধরেছে। এখন গোটা সংসারটাই তার উপর নির্ভরশীল। একটা ছোট বোন আছে।

কৃত্তিকা। এই বছরে আঠাশে পড়ল। কাজের মধ্যে একটা কাজই জানে। রূপচর্চা ও ফ্যাশন! তার বিয়ে দিতে হবে। একটা বেকার, ফ্রাস্ট্রেটেড ভাই আছে। সে পড়াশোনাটাও ঠিকমতো করেনি। দু'-একবার একে-তাকে ধরে তার চাকরির বন্দোবস্তও করে দিয়েছে ঋতিকা। কিন্তু চাকরিও রাখতে পারেনি। দু'টো জিনিসই সে জীবনে ঠিকঠাক করতে পেরেছে। প্রথমত, প্রেম করে বিয়ে। দ্বিতীয়ত, বিয়ের একবছরের মাথাতেই স্ত্রীকে গর্ভবতী করার মহান দায়িত্ব পালন। সুতরাং ঋতিকার একার উপার্জনেই গোটা সংসার চলে।

এই পরিস্থিতিতে স্বার্থপরের মতো নিজের বিয়ের কথা মাকে কি করে জানায় ঋতিকা! নীল তাকে আশ্বস্ত করে, "তুমি মাসিমাকে বলো যে বিয়ের পরও তুমি ওঁকে হেলপ করতে পারবে। তুমি না পারো, আমি বলছি...।"

"না!" ভয়ার্ত গলায় সে বলে, "নীল, প্লিজ আমায় হ্যান্ডল করতে দাও। আমি সময় করে ঠিক বলব।"

"আর কত সময় ঋতু?" নীলের গলায় অদ্ভুত আর্তি, "আর কতদিন? তুমি চাইলে আমি সারাজীবন অপেক্ষা করব। এতদিন ধরে তো একাই আছি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমার জন্য একা থাকতে পারব। কিন্তু বয়স যে বসে থাকবে না! তোমার পঁয়ত্রিশ। আমি চল্লিশ পেরিয়েছি। অলরেডি আমরা দু'জনেই অনেক দেরি করে ফেলেছি। আর কত দেরি? কতদিন দু'জনে টিন-এজারদের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করব, আর কত রাত রেস্তরাঁয় ডিনার করতে করতে একে অপরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলব? আমরা কি কখনই একসঙ্গে থাকতে পারব না? তুমি কি কখনও আমার জীবনে আসবে না ঋতু?"

ঋতিকা মাথা নিচু করে বসে থাকে। নীলের প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই। সে নিজেও জানে না শেষপর্যন্ত কি হবে। নিজস্ব কিছু স্বপ্ন তারও আছে। কিন্তু সে স্বপ্ন দেখার সময় বা সুযোগ নেই।

নীল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঋতিকার নীবরতার অর্থ সে বোঝে। তাই বিশেষ কথা বাড়াল না। গম্ভীরভাবে ঋতিকার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে গাড়ি থামিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি সুযোগ বুঝে এগোও। আই অ্যাম কিপিং মাই ফিঙ্গারস ক্রসড।"

ঋতিকা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করে, "থ্যাঙ্কস নীল।"

নীল আলতোভাবে কাঁধ ঝাঁকায়। তারপর হাত নাড়িয়ে চলে গেল হুশ করে। সে বিচলিত ও অসহায়ভাবে চলে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। অপস্রিয়মাণ গাড়িটার লাল ব্যাক লাইট যেন ব্যঙ্গ করছে। ওই চলে যাচ্ছে নীল। শেষপর্যন্ত কি চলে যেতেই হবে তাকে? ওই আলোর বিন্দুর মতো সেও কি মিলিয়ে যাবে ঋতিকার জীবন থেকে! একটা অনিশ্চয়তা আর ভয় বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল ঋতিকা। একটা আলগা হতাশাও মনের ভিতরে কাজ করছিল। ভাগ্যিস বাবা বাড়িটা তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন। নয়তো মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও থাকত না। গত দশ বছর ধরে এই বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য আপ্রাণ খেটে চলেছে সে। কিন্তু সংসারে কাউকেই বোধহয় সন্তুষ্ট করার উপায় নেই। সে জানে সারা দিনের অক্লান্ত খাটুনির পর বাড়িতে তার জন্য কি কি অপেক্ষা করছে! ছোট ভাইটা হয় বিছানায় আড়কাত হয়ে শুয়ে টিভি দেখবে, নয়তো পাড়ার ক্লাবে টপ্পা মারতে বেরিয়ে যাবে। মা বাতের ব্যথা নিয়ে শুয়ে ঘ্যানঘ্যান করে অভিযোগ করবেন। ভাইয়ের গর্ভবতী বউটা রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে কিছুক্ষণ অভিযোগ শুনে ক্লান্ত, বেঢপ শরীরটাকে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে চলে যাবে। আর বোন? সে হয়তো এখন ইন্টারনেট ঘেঁটে রূপচর্চার নতুন কোনও উপায় খুঁজছে!

ক্লান্ত ভাবে কলিংবেল বাজাল ঋতিকা। এখন তার খুব ঘুম পাচ্ছে। মাথাটাও বেশ ধরে আছে। এই মুহূর্তে এক কাপ কড়া চা আর অবিচ্ছিন্ন শান্তি প্রয়োজন।

"দিদি।" কৃত্তিকা দরজা খুলে উঁকি মারছে। ঋতিকা তার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়! রোজ এই একই দৃশ্য! কৃত্তিকার মুখে সাদা সাদা কিছুর প্রলেপ! মূলতানি মাটি না চন্দন—কে জানে! মাথায় খোঁচা খোঁচা ক্লিপের মতো কতগুলো কি যেন! এগুলো মাথায় দিলে কী উপকার হয় কে জানে! কৃত্তিকার চুল ক্রমাগতই পাতলা হচ্ছে! তার উপর এই সব খিমচি ক্লিপগুলো লাগিয়ে রেখে চুলের আরও বারোটা বাজাচ্ছে। যদি কোনওদিন রূপবিশেষজ্ঞরা বলেন যে বেগন স্প্রে নিয়মিত চুলে স্প্রে করলে চুলের ভলিউম বাড়বে, তবে হয়তো তাও করবে কৃত্তিকা! কোনও বিশ্বাস নেই!

ঘরে পা দিতে না দিতেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল তার। দুপুরের ভাতের এঁটো থালাগুলো তখনও টেবিলের ওপরে শোভা পাচ্ছে! কেউ সরিয়ে রাখার সময় পায়নি! সোফার উপরে একগাদা জামা-কাপড় ডাঁই করা! গুছিয়ে রাখার কথা কারওর মনে হয়নি! বসার ঘরের পাখাটা ক্রমাগত ক্যাঁচ ক্যাঁচ করেই চলেছে। সকালেই সে অফিসে যাওয়ার পথে ইলেকট্রিশিয়ানকে পাখাটা দেখার কথা বলে গিয়েছিল। ভাই নির্মাল্যকেও পইপই করে বলেছে দুপুর নাগাদ লোকটাকে আরেকবার তাগাদা দিতে। ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বাররা চিরকালই ভুলো প্রকৃতির। প্রয়োজনের সময় কারওর দেখা পাওয়া যায় না! তাই হুড়ো না দিলে কাজ হয় না। কিন্তু নির্মাল্য আরও এককাঠি সরেস! লোকটাকে তাগাদা দিতেও ভুলে গেছে!

"ঋতু।" ভিতরের ঘর থেকে মায়ের চড়া গলা ভেসে এল, "তুই আমার বাতের তেলটা এনেছিস? আর টয়লেট সিট?"

মনে মনে জিভ কাটল সে। ইশশ, আজও ভুলে গেল! অফিসে কাজের চাপে বাতের তেল আর টয়লেট সিটের কথা মাথা থেকে বেরিয়েই গেছে। মা অনেকদিনই বাতের ব্যথায় ভুগছেন। তবে ইদানীং ব্যথাটা বাড়াবাড়ি করছে। পুরনো বাড়ি বলে বাথরুমে কমোড সিস্টেম নেই। ওদিকে মা হাঁটু ভাঁজও করতে পারছেন না!

সে ঠোঁট কামড়ে জানায়, "আজ ভুলে গিয়েছি মা। খুব কাজের প্রেশার ছিল!"

"কাজের প্রেশার তোর কবে থাকে না?" মা প্রায় কেঁদে ফেললেন, "সাতদিন ধরে আমার ওঠার ক্ষমতা নেই! সে কথা মনে আছে তোর? বুঝিস না, কষ্ট হয়?"

ঋতিকা এবার একটু বিরক্ত হয়, "নিমু কি করছিল? ও কি একটু বেরিয়ে বাতের তেল আর টয়লেট সিটটা অন্তত কিনে আনতে পারে না?"

"নিমুর দোষ দিবি না।" মায়ের কণ্ঠস্বর আরও একটু চড়ল, "সকাল থেকে ছেলেটার শরীর খারাপ। সারাদিন ধরে বিছানায় শুয়ে ছিল। ঠিকমতো খাবারও খায়নি। এখন একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।"

হাওয়া না কচু! খোঁয়া খেতে বেরিয়েছে। এবং খোঁয়ার সঙ্গে অকৃত্রিম গাঁজার মিক্সচারও আছে। বেশ কয়েকবার নির্মাল্যর গায়ে গাঁজার গন্ধটা পেয়েছে সে। কিন্তু সেকথা বললে মা আরও বেশি অভিমান করবেন। কে তাকে বোঝাবে যে কোনও কাজ করতে বললেই নিমুর শরীর খারাপ হয়! সে একটু ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বলে, "শরীর খারাপ তো হবেই মা। ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে আনতে বলেছিলাম যে! বসার ঘরের পাখাটা কিরকম আওয়াজ করছে শুনেছে? কোনওদিন নির্ঘাৎ মাথায় ভেঙে পড়বে!"

"তার জন্য নিমু কেন? তুই বলে যেতে পারিসনি?" মা ফুঁসে উঠেছেন, "তোর

অফিসের রাস্তাতেই তো পড়ে ওর দোকান।"
"আজই বলেছিলাম। কাল আবার বলে যাব।" বলতে বলতেই ঋতিকা বাথরুমে ঢুকে গেল। এখন তার অনেক কাজ। দুপুরের এঁটো বাসনপত্র মাজতে হবে। তোলা কাজের মেয়েটা একবেলা আসে। এ বেলা তার আসার কথা নয়। তাই সব কাজ ঋতিকাকেই করতে হবে। বাসন মেজে, ঘর পরিষ্কার করে, জামা-কাপড় গুছিয়ে নেবে সে। তারপর নিজেই এক কাপ চা তৈরি করে চুমুক দিতে দিতে রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিতে শুরু করবে। ভাত, রুটি, তরি-তরকারি একা হাতেই করে নেবে সে। গর্ভবতী ভ্রাতৃবধূকে কাজ করতে বলা যায় না! আর কৃত্তিকা! কিচেনে ঢুকলে তার রং কালো হয়ে যাবে! ফর্সা রংটাই যে তার মূলধন! অগত্যা ঋতিকাই ভরসা!
সে চটজলদি ফ্রেশ হয়ে এসে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গত দশ বছর ধরে এমন ভাবেই নিঃশব্দে ডিউটি করে চলেছে।

"হোয়াট ডিটেলস!" ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলল, "কি লক্ষ্য করব? দ্যাট ওম্যান কিলড মাই ফাদার সো ব্রুটালি...!"

রোগা মা, বোন আর অকর্মণ্য ভাইয়ের ফাই-ফরমাশ খাটছে। পাড়ার সবাই বলে—অনেক পুণ্য করলে ঋতিকার মতো মেয়ে পাওয়া যায়। ঋতিকা রুটির জন্য আটা মাখতে মাখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মা নির্ঘাৎ অনেক পুণ্য করেছেন। কিন্তু সে কি পাপ করেছে? তবে কেন অন্যের প্রতি কর্তব্য করতে করতে নিজের স্বপ্নগুলোকেই বিসর্জন দিতে হয় তাকে? তার আচমকা নীলের কথা মনে পড়ে যায়।
"আর কতসময় ঋতু? আর কতদিন?" এর হাত থেকে মুক্তি কি নেই?

৪

"আই ডোন্ট নো দিস লেডি।"
ঝাঁঝালো স্বরে উত্তর এল, "শি ইজ আ মার্ডারার। শি ইজ নট মাই মাম। আই ডোন্ট নো হার!"
বিদিশা সেনের একমাত্র সুপুত্র রানাজী সেনের কথায় বিস্মিত হয়ে গেল ঋতিকা! এই ছেলেকে ন'মাস গর্ভে ধারণ করেছেন বিদিশা। কুড়ি বছর ধরে তাকে লালন-পালন করেছেন। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লে এই ছেলেরই মাথার কাছে বসে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। তারই ফরমায়েশে দিনের পর দিন নিত্যনতুন টিফিন তৈরি করে দিয়েছেন। তার সমস্ত হুজ্জতি, অন্যায় আবদার সহ্য করেছেন। আর আজ সেই ছেলেই কোর্টে দাঁড়িয়ে মায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে। বলছে—মাকে চেনে না!
প্রাথমিক বিস্ময়টা কোনওমতে কাটিয়ে উঠে সে জানতে চাইল, "সেদিন কী হয়েছিল তা কি কাইন্ডলি একটু মনে করে বলতে পারো?"
রানাজীর ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে, "অফিসার ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি আপনাকে পাঠিয়েছেন না?"
"ইয়েস।"
"তিনি আমার স্টেটমেন্ট আপনাকে দেননি?"
ঋতিকা শান্তভাবে বলল, "দিয়েছেন। কিন্তু আমি ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্টই বেশি প্রেফার করি।"
রানাজী বিরক্তিতে উগ্রভাবে কাঁধ ঝাঁকায়, "নাথিং স্পেশ্যাল। সেদিন পাপা একটা পার্টি থ্রো করেছিল। ফর হিজ বিগ প্রোমোশন। হি ওয়াজ গোয়িং টু বি দি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ দ্য কোম্পানি। মাম সেদিন পুরো প্রোগ্রামটা একা হাতেই অর্গানাইজ করেছিল। ফ্রম ভেরি বিগনিং টু এন্ড—এভরিথিং ওয়াজ পার্ফেক্ট। ফুড ওয়াজ ডেলিশিয়াস। অ্যান্ড শ্যাম্পেন শাওয়ার... এভরিথিং ওয়াজ গর্জিয়াস! উই আর ভেরি হ্যাপি! উই আর লুকিং আ বিউটিফুল, রিচ-অ্যান্ড হেলদি ফ্যামিলি টুগেদার! সেদিন ইভনিঙে এই ঘটনা। রাতে...!"
ঋতিকার ইচ্ছে করছিল ছেলেটিকে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বলে, 'বাংলা বলতে লজ্জা করে?' কিন্তু চেপে গেল। এমন ট্যাশ ছেলেপুলে সে এই প্রথমবার দেখছে না।
"আর কিছু হয়েছিল?" ঋতিকা জোর গলায় বলল, "এমন কিছু যাতে তোমার মা কষ্ট পেয়েছিলেন? কিংবা অপ্রতিভ হয়েছিলেন? এনিথিং, হুইচ মেড হার ফিল ব্লু?"
"নট অ্যাট অল।" ছেলেটি প্রতিবাদ করে, "ইনফ্যাক্ট শি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। সেদিন মাম পার্টিতে ফার্স্ট নিজের লেখা কবিতা রিসাইট করছিল। পিপল ওয়্যার ভেরি এন্টারটেইনড বাই হার পোয়েমস। পাপা অনেকরাত অবধি মামের লেগপুলিং করছিল। বলছিল, "এবার কবিনী হাতা-খুন্তি ছেড়ে কাগজ কলম ধরবেন! বলা যায় না, নোবেলও পেতে পারেন!" উই আর মেকিং ফান অফ হার! অ্যান্ড শি ওয়াজ অলসো এনজয়িং দ্যাট।"
"হুঁ।" ঋতিকার ভুরু কুঁচকে যায়, "তারপর?"
"তারপর শেষ রাতের দিকে পাপা'র চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল!" রানাজী তার উস্কোখুশকো চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, "দৌড়ে গিয়ে দেখি মা হাতুড়ি দিয়ে পাপা'র মাথায়...।" বলতে বলতেই সে থেমে গেল! তার চোখের কোণে রক্তিমাভা, "দ্যাটস অল।"
"দ্যাটস অল?" সে অবাক, "আর কিছু লক্ষ্য করেননি? প্লিজ ট্রাই টু রিমাইন্ড এভরিথিং। এভরি ডিটেলস!"
"হোয়াট ডিটেলস!" ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলল, "কি লক্ষ্য করব? দ্যাট ওম্যান কিলড মাই ফাদার সো ব্রুটালি...! তার মধ্যে আর কি লক্ষ্য করা সম্ভব!" সে আপনমনেই বলল, "অথচ কী করেনি পাপা ওর জন্য! অলওয়েজ ফাইভ স্টার ট্রিটমেন্ট দিয়েছে! দামি শাড়ি, দামি গয়না, ধনতেরাস, ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে একরাশ গিফট! উইক-এন্ডে ফাইভস্টার হোটেলে ডিনার...! আমি ভাবতাম মাম পাপাকে খুব ভালবাসে। বাট আই ওয়াজ রঙ! শি নেভার লাভড মাই পাপা!"
"আর দ্যাট ওম্যান?" ইচ্ছে করেই খোঁচাটা মারল সে, "তিনি কি কিছু করেননি তোমার পাপার জন্য?"
"কি করেছে?" রানাজী ফুঁসে ওঠে, "দু'বেলা রান্না করেছে। দেখাশোনা করেছে। জামাকাপড় গুছিয়ে দিয়েছে। সবাই করে। সব ওয়াইফই করে। বেশি কী করেছে?"
ঋতিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—তাই তো। সবাই করে। বেশি কী করেছে? এই যে সে রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাজারে দৌড়য়, সকাল সকাল সবার খাবার তৈরি করে, মাকে স্নান করিয়ে-টিফিন করিয়ে, ওষুধ খাইয়ে, নিজে স্নান করে কোনওমতে দু'মুঠো নাকে মুখে গুঁজে অফিসে আসে, আবার সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে বাড়ি

ফিরে ফের সকলের তরিযুত করতে বলে—বেশি কী করে? নির্মাল্য কিংবা কৃত্তিকা যখন বিছানা ছাড়ে ততক্ষণে তার অফিস যাওয়ার সময় হয়ে যায়! তা সত্ত্বেও ওদের জন্য বেড-টি, টিফিন করে দিতে কখনও ভুল হয় না তার। সত্যিই তো, বেশি কী করে?"

কথাটা হয়তো এত গায়ে লাগত না ঋতিকার। কিন্তু আজ সকালের ঘটনায় মনটা তিতো হয়ে আছে। বিশেষ করে মা আর নির্মাল্য যেন ক্রমাগতই নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে তার ওপর! কখনও কখনও মনে হয় এটাও একজাতীয় নির্যাতন! মেন্টাল টর্চার!

ঘটনাটা নেহাৎই সামান্য। পাড়ার 'যুবক সঙ্ঘের' ছেলেগুলো আজ চাঁদা চাইতে এসেছিল। তখন সে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কলিংবেলের মুহুর্মুহ শব্দে বিরক্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "কি ব্যাপার?"

একটা ফর্সামতো ছেলে তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে, "আপনি? নিমুদা নেই?"

"নিমুদা ঘুমোচ্ছে। যা বলার আমাকেই বলো।"

"আপনাকে?" ছেলেটা বিস্মিতদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, "বাড়িতে আর কেউ নেই?"

এবার বিরক্তির কুঞ্চন পড়েছিল ঋতিকার ভুরুতে, "কেন? আমাকে দিয়ে কাজ হবে না?"

"না। মানে...।" পিছন থেকে একটা ছাগলদাড়িওয়ালা ছেলে বলে, "আমরা আসলে নিমুদাকেই খুঁজছিলাম।"

"আমি নির্মাল্যর দিদি।" সে জোরালো গলায় বলল, "যা বলার আমাকেই বলতে পারো।"

"না, মানে... ইয়ে...!" ফসা ছেলেটা ইতস্তত করে, "এ বাড়িতে আর কোনও মেল মেম্বার নেই? আপনি তো...!"

ঋতিকার মাথাটা হঠাৎই গরম হয়ে গেল। মেল মেম্বার দিয়ে এরা কি ধুয়ে জল খাবে! অথবা বাড়ির কর্তাকে খুঁজছে! জানে না যে এ বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রী একজনই! আর সে যে-ই হোক, নির্মাল্য কোনওমতেই নয়!

সে হয়তো দু'-একটা কড়া কথা বলেই দিত, তার আগেই নির্মাল্য ঘুম চোখ কচলাতে কচলাতে এসে দাঁড়াল তার পিছনে। মুরুব্বির মতো ভারী গলায় বলল, "ও, তোরা এসেছিল? এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আয়। চা খাবি?"

এমনভাবে কথাটা বলল যেন এক ডজন দাস-দাসী মোতায়েন করে রেখেছে সে। মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আবির্ভূত হবে। কথাটা বলাই যেত। কিন্তু বাইরের লোকের সামনে সিনক্রিয়েট করার লোক ঋতিকা নয়। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফের কিচেনের দিকে চলে গেল। এখন প্রায় হাফ ডজন লোকের জন্য চা করতে হবে তাকে। চা-বিস্কুট দিতে না দিতেই ডাবল ডিমের ওমলেট আর মিষ্টির অর্ডার এল। নির্মাল্য সম্প্রতি 'যুবক সঙ্ঘের' প্রেসিডেন্ট হয়েছে! সন্ধেবেলায় সেখানে গিয়ে তাস পেটায়। সিগারেট-গাঁজা খায়। অতএব প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকে খালি মুখে ফেরানো যায় না সাঙ্গোপাঙ্গদের!

অবশেষে খেয়ে দেয়ে সিগারেট ফুঁকে ছেলেগুলো যখন বিদায় নিল, তখন ঋতিকার অলরেডি কুড়ি মিনিট লেট হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও সে ঝগড়া করার মুডে ছিল না। দু'-এক কথায় নিজের অসন্তুষ্টি জানিয়েই হয়তো অফিসের পথে বেরিয়ে যেত। কিন্তু তার মাথায় বাজ পড়ল যখন দেখল হ্যান্ডব্যাগে শুধু গোটা তিনেক দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো পড়ে আছে! দু'টো পাঁচশো টাকার নোট বেমালুম হাওয়া!

ঋতিকার মাথায় রক্ত চড়ে যায়! মাইনে পেয়ে প্রায় সব টাকাই সে সংসার খরচের জন্য মায়ের হাতে তুলে দেয়। নিজের জন্য শুধু হাজার টাকা রাখে। ওটাই তার সারা মাসের খরচ! এক হাজার টাকায় অনেক কষ্টে টেনেটুনে সারা মাস চালায় সে। ট্যাক্সিতে চড়ার বিলাসিতা করে না। বাসে, ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে অফিসে পৌঁছয়! দামি রেস্তরাঁয় খাওয়ার প্রবল ইচ্ছে হলেও চেপে রাখে। নিজের জন্য একটা পয়সাও বাড়তি খরচ করে না। পার্লারে যায় না। দামি লিপস্টিক বা দামি পারফিউম কেনে না। সস্তার জিনিসেই ম্যানেজ করে নেয়। বন্ধুরা তার কাছে জন্মদিনের ট্রিট চাইতে চাইতে এখন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধুদের সামান্য এগরোল খাওয়াতে হলেও চিন্তায় পড়ে যায়। সারামাস কৃচ্ছ্রসাধন করে মাসের শেষে যে একশো-দু'শো টাকা বাঁচে, সেটুকু ব্যাঙ্কে জমায়। এমনকি নীলকে আজ পর্যন্ত একটা গিফটও দেয়নি। ঋতিকার সারা মাসের মূলধন মাত্র হাজার টাকা!

কিন্তু সেই এক হাজার টাকা তার ব্যাগে নেই!

অসম্ভব রাগে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে সে, "নু-মু!... নি-ই-মু!"

নির্মাল্য আধখানা শেভ করা গাল নিয়ে এসে দাঁড়াল। ও গালে তখনও শেভিং ক্রিমের ফেনা। চিরাচরিত ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল, "কি হয়েছে? চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছিস কেন?"

"আমার ব্যাগ খুলেছিস তুই? এক হাজার টাকা নিয়েছিস?"

নির্মাল্য তেমনই নিরুত্তাপ গলায় বলে, "হ্যাঁ। ওরা চাঁদা চাইছিল। তাই...।"

"তাই একহাজার টাকা দিয়ে দিলি!"

বিস্ময়ে, রাগে ঋতিকার চোখ লাল হয়ে যায়, "এক হা-জা-র টাকা চাঁদা দিয়েছিস!"

"আফটার অল আমি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। হাজারের কম দিলে প্রেস্টিজ থাকে না। ওসব তুই বুঝবি না।"

"মানে?" সে চেঁচিয়ে ওঠে, "তুই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট? নোট ছাপার মেশিন আছে তোর বাড়িতে? না তুই ব্যাঙ্কের ওনার! পকেটে এক পয়সা নেই, অথচ বাবুয়ানি ষোল আনা। কে বলেছিল তোকে ফুটানি মারতে?"

"টাকার খোঁটা দিবি না!" নির্মাল্য গর্জে ওঠে, "মস্ত তো মাস গেলে কেটেকুটে হাতে বারো হাজার টাকা পাস! আমাদের ক্লাবে এমন সব ছেলে আছে যারা বারো হাজার টাকার মদ গিলে মুতে দেয়!"

"তাই?" ঋতিকা প্রায় তেড়ে যায়, "তবে তাদের কাছেই যা না। বল, মাস গেলে তোকে যেন অন্তত দু'বেলা খাওয়ার পয়সাটা মুফতে দেয়! এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই, বড় বড় কথা!" বলতে বলতে তার চোখে জল এসে যায়, "টাকা রোজগার করাটা কত কষ্টের সে ধারণা আছে তোর? বারো হাজার টাকায় পাঁচজনের সংসার কীভাবে চলে জানিস? প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা শুধু ওষুধেরই খরচ! তোলা কাজের লোকটাও পরের বছর থেকে হাজার টাকা মাইনে চাইবে! যাতে রান্নার লোক রাখতে না হয় জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও তোদের জন্য রান্নাবান্না করি। বাজারের ভারী মোটা ব্যাগটা রোজ সকালে টেনে আনতে কতটা কষ্ট হয় বুঝিস? একটা রিকশাও নিতে পারি না বাজে খরচের ভয়ে! আর তুই বাবুয়ানি করে বেড়াচ্ছিস!"

"ধুস শালা!" নির্মাল্য মুখ মুছে গামছাটাকে প্রায় ঋতিকার মুখেই ছুঁড়ে মারল, "আজ থেকে শা-লা তোর পয়সায় খাবই না। কি এমন করিস যে সবসময় কথা শুনতে হবে! নিজেকে ডিক্টেটর ভাবিস না কি! তোর কথাতেই চলতে হবে সবাইকে!"

"হ্যাঁ।" চোখে রক্ত আর জল নিয়ে তাকিয়েছিল সে, "যদি দিদির ঘাড়ে বসে

খেতে হয়, তবে কথা শুনতেই হবে। আর কথা শুনতে ভাল না লাগলে বেরিয়ে যা। নিজের ভাত নিজে রোজগার কর।"
"তাই করব।"
নিমু রাগে মসমস করতে করতে জুতো পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল। পায়ের ধুপধাপ আওয়াজে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে গেল যে সে বেরিয়ে যাচ্ছে।
ভিতরের ঘর থেকে মা মড়াকান্না কেঁদে উঠলেন, "খেতে দিলি না! ওকে দু'মুঠো খেয়েও যেতে দিলি না তুই! ভাতের খোঁটা দিলি!"
"বেশ করেছি।" ঋতিকার মাথা থেকে তখনও রক্ত নামেনি, "ক্ষমতা নেই। শুধু পরের পয়সায় ফুটানি দেখায়!"
"পরের পয়সা!" মা উন্মত্তের মতো কোনওমতে বেঁকতে বেঁকতে নেমে এলেন বিছানা থেকে। আলমারি খুলে এ মাসে দেওয়া টাকার প্যাকেটটা ছুঁড়ে মারলেন ঋতিকার মুখে, "নিয়ে যা তোর টাকা! আমাদের কারওর দরকার নেই। আমরা না খেয়ে শুকিয়ে মরব, কিন্তু তোর টাকায় হাত দেব না। নিয়ে যা! কী এমন করেছিস আমাদের জন্য? কী এমন সুখে রেখেছিস যে এত টাকার রোয়াব! নিয়ে যা... যাঃ!"
ঋতিকা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে টাকার প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সত্যিই তো! কী করেছে সে ওদের জন্য! কতটুকুই বা করেছে! একটু পরেই বুঝতে পারবে কী করেছে! একটু পরেই নির্মাল্য বুঝতে পারবে খিদে কাকে বলে। একটু পরেই মা বুঝবেন টয়লেট সিট, বাতের তেল আর ওষুধগুলো না থাকলে কি হয়! তবু কেউ স্বীকার করবে না।
তার মনে পড়ে যায় নীলের নিষ্ঠুর কথাগুলো, "যতদিন তুমি নিঃশব্দে কাজ করে যাবে, ততদিন কেউ বুঝবে না যে আসলে তুমি ঠিক কি করছ! একবার নিষ্ঠুর হয়ে দেখো। একবার সব কাজ করা থামিয়ে দাও। তাহলেই দেখবে সবাই তোমার মর্যাদা বুঝছে!"
ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল। নীল জানে না নিষ্ঠুর হওয়াটা কত কঠিন! এই যে এই মুহূর্তে লাল রঙের চুলওয়ালা বড় লোকের ছেলেটা বড় বড় বুকনি মারছে, সে কি জানে যে মাম যদি পাপার ব্রেকফাস্ট তৈরি করে না দিত, জামাকাপড় টিপটপ করে সাজিয়ে না রাখত, পাপার ঔরসজাত সন্তানকে বুকে করে মানুষ না করত— তবে ঠিক কী হত! এখন বুঝছে হয়তো। কিন্তু স্বীকার করবে না!
সেই তীব্র রাগটা ফের দপ করে জ্বলে উঠেছে মাথার মধ্যে। সে রানাজীর দিকে তাকায়, "থ্যাঙ্কস ফর ইওর কো-অপারেশন। লাস্ট কোশ্চেন...।"
ছেলেটা বিরক্ত হয়ে বলল, "প্রসিড।"
"যখন তুমি হায়ার সেকেন্ডারিতে বা জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক করেছিলে, তখন কি তোমার মাম অলসো মেকিং ফান অব দ্যাট?" উত্তেজনায় অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক ইংলিশে প্রশ্নটা করে ফেলে ঋতিকা, "মা কি তোমার লেগপুলিং করেছিলেন? অথবা বাবা বলেছিলেন, "আমার ছেলে এবার মা-বাবার হাত ছেড়ে অন্যের নাড়ি টিপতে যাচ্ছে! বলা যায় না, বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় এডিশন হলেও হতে পারে।" বলেছিলেন কেউ? তোমার অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করেছিল? অ্যান্ড আর ইউ অলসো এনজয়িং দ্যাট?"
বোকার মতো তাকিয়ে থাকে ছেলেটা। যেন প্রশ্নটার তাৎপর্য বুঝতেই পারছে না! ঢোঁক গিলে বলে, "দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যাচিভমেন্ট! আ গোল্ডেন অপর্চুনিটি! মাম অ্যান্ড পাপা ওয়াজ প্রাইড অফ মি! হোয়াই শুড দে...?"
"রাইট।" মুচকি হাসল ঋতিকা, "দেন হোয়াই বোথ অব ইউ আর মেকিং ফান অব হার পোয়েমস? ইট ওয়াস অলসো অ্যান অ্যাচিভমেন্ট ফর ইওর মাম। নো?"
রানাজী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে উঠতে পারে না! ঋতিকার দু'চোখ তখন জ্বলছে!

৫

"গোবিন্দ বোলো হরি, গোপাল বোলো, রাধারমণ হরি, গোপাল বোলো...।"
জেলের আলো-আঁধারি কুঠুরিতে বসে হঠাৎ মধুর কণ্ঠে নামগান শুনে ঋতিকা সচকিত হয়ে ওঠে। এমন পরিবেশে এমন সুরেলা গান শুনতে পাবে তা আশা করেনি। ছোট্ট অপরিসর সেলটায় একটা মাত্র কম পাওয়ারের বাল্ব মিটমিটিয়ে জ্বলছে। তার মৃদু আলোতে দু'জনের মুখ স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় না। তবু হয়তো আকস্মিকভাবে পাশের সেল থেকে গানের সুর শুনে ক্ষণিকের বিস্ময় ঋতিকার মুখে ছাপ ফেলেছিল। আড়চোখে তা লক্ষ্য করে 'খুক খুক' করে চাপা হাসি হাসলেন বিদিশা সেন।
"হাসছেন যে?"
বিদিশা সেন তখনও হাসছেন।
কোনওমতে হাসি চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, "ওই যে। তোমার নিরূপা রায় ভজন গাইছেনে!"
কথাটা মর্মার্থ তখনও বোঝেনি ঋতিকা। কিন্তু সে চুপ করে তাকিয়ে রইল বিদিশার দিকে। এতদিনে মোটামুটি মহিলার চরিত্র সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা তৈরি হয়েছে। তিনি অনেক সময়ই সুর্বোধ্য কথা বলে ফেলেন। তারপর অবশ্য নিজেই আপনমনে সে হেঁয়ালির মর্মার্থ বলে দেন। তাই ঋতিকা তাকে সময় দিল।
"ভজনটা কে গাইছেন জানেন?" তার অনুমানকে সঠিক প্রমাণ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিদিশা নিজেই মুখ খুললেন, "পাশের সেলের আরেক কয়েদী। গৌরী কেজরিওয়ালা। আমার মতোই স্বামীহন্তা। তবে কারণটা সম্পূর্ণ আলাদা।"
"কি কারণ?"
"যে কারণটা ডিফেন্স কাউন্সিলর অনেক চেষ্টা করেও আমার ওপর চাপাতে পারেননি।" বিদিশা সকৌতুকে বলেন, "লম্পট স্বামীর অত্যাচার! ওঁর স্বামীর ক্যারেক্টার বলে কিছু ছিল না। পার্ফেক্ট উওম্যানাইজার! ভদ্রমহিলা তা সত্ত্বেও সহ্য করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ওঁর স্বামী নিজের রিসেপশনিস্টকেই বাড়ি এনে তুলে খুল্লমখুল্লা বৃন্দাবন খুলে বসলেন, তখন আর সহ্য হল না! নিজের স্বামীর লাইসেন্সড বন্দুক দিয়ে দু'জনকেই নিকেশ করে দিলেন।" বলতে বলতেই হেসে ফেললেন তিনি।
ঋতিকা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বিদিশার দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম একটা ট্র্যাজিক ঘটনায় হাসার মতো কী উপাদান পেলেন মহিলা!
"আশ্চর্য! স্বামীর লাম্পট্য সহ্য করতে পারলেন না! অথচ এখন সেই দেবতাকেই ভজনা করছেন, যিনি বহুনারীবল্লভা!"
হাসতে হাসতেই বললেন বিদিশা,

"বেশ করেছি।" ঋতিকার মাথা থেকে তখনও রক্ত নামেনি, "ক্ষমতা নেই। শুধু পরের পয়সায় ফুটানি!"

"মনুষ্যচরিত্র! বুঝলে? আমরা ভুলটাকে ভুল বলে চিনতে পারি ঠিকই। অথচ সেই ভুলের মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। বরং সেই ভুলটাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করি।"
ঋতিকা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, "আপনার ক্ষেত্রেও কি তাই হয়েছিল?"
"কি হয়েছিল?" সকৌতুকে বললেন বিদিশা।
"আপনিও কি কোনও ভুলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন?"
"উঁহু...।" তিনি মাথা নাড়ছেন, "ইনডিভিজুয়ালের কথা বলছি না। সব মানুষের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য। তোমার ক্ষেত্রে কি প্রযোজ্য নয়?"
ঋতিকার গা শিরশির করে ওঠে। বিদিশার চোখ দু'টো বড় তীক্ষ্ণ। দৃষ্টি নয়, যেন এক্স-রে রশ্মি! সে নিজেকে সামলে নেয়। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বলে, "আচ্ছা, এখানে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আপনি তো ডি-লাক্স লাইফে অভ্যস্ত ছিলেন...!"
তিনি ঋতিকার কৌশলটা বুঝে ফেলে মৃদু হাসলেন, "আগে ডি-লাক্স লাইফে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন জেলের লাইফে অভ্যস্ত হয়েছি। মেয়েদের আর কিসের অভ্যাস ভাই? 'অভ্যাস' শব্দটা আমাদের ডিকশনারিতে থাকতে নেই। 'মানিয়ে নেওয়া' শব্দটা বরং অনেক বেশি জরুরি।"
"তবু?"
"সত্যি বলতে কি, এখানে আমার কিন্তু তেমন অসুবিধে হচ্ছে না।" বিদিশা হাসতে হাসতেই বললেন, "আগে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই টেনশনে পড়তে হয় কী ব্রেকফাস্ট হবে! ছেলের বাবা পোচ ছাড়া খায় না। ছেলে আবার ওমলেট পছন্দ করে। ছেলের বাবা কফিতে কতটুকু দুধ খাবে, ক'চামচ চিনি খাবে—সুগার, প্রেশারের ওষুধ ঠিকমতো খেল কি না, ছেলের আবার দুধে ছোটবেলা থেকেই অ্যালার্জি—তার জন্য ফ্রুটজুস মাস্ট—এসব ভাবতে ভাবতেই সকাল পার হয়ে যেত। বাইশ বছরে অকেশন ছাড়া একদিনও সানরাইজ দেখিনি জানো?"
তার চোখ দু'টোয় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি, "সেসব চিন্তা এখানে করতে হয় না। সকালবেলাটা নিজের মতো করে কাটাতে পারি। কখনও কখনও আপনমনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাই। কখনও রবি ঠাকুরের কবিতা মুখস্থ বলে সময় কাটাই। তারপর খাবার-টাবার খেয়ে সরকার বাহাদুরের দেওয়া কাজ করি। বাড়িতে একগাদা স্পাইসি খাবার খেতে হত। আমার কষ্ট হত। কিন্তু ছেলে আর স্বামী একগাদা ঝাল, তেল চপচপে খাবার ছাড়া খেতে পারত না। তাই ওদের মুখ চেয়ে স্পাইসি ফুডেই অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিলাম। তার সাইড এফেক্ট হিসেবে পেটের প্রবলেম, কোলাইটিস ধরেছিল। প্রায় বিকেলেই মাথা ব্যথা হত। এখন নুন-তেল কম দেওয়া খাবার খেয়ে বদহজম, অম্বলের রোগটা গেছে। কোলাইটিসের পাত্তাও পাচ্ছি না। শরীর অনেক ফুরফুরে লাগে। গদিওয়ালা বিছানায় শুয়ে স্পন্ডেলাইটিস ধরেছিল। এখন তক্তপোষে শুই। ফলস্বরূপ ঘাড় ব্যথা, কাঁথ ব্যথা হাওয়া। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে কবিতা লিখতে বা বলতে কেউ বারণ করে না। পুলিশগুলো রেগে যায় ঠিকই। কিন্তু কয়েদিদের কবিতা আওড়াতে বা লিখতে দেওয়া যাবে না, এমন কোনও আইন ভারতীয় সংবিধানে নেই।"
"এমন কোনও আইন কি আপনার বাড়িতে ছিল?"
ঋতিকার প্রশ্নটায় কাজ হল। বিদিশার মুখ থেকে হাসির রেশ মিলিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে বললেন, "না। বাধা কেউ দিত না। তবে উৎসাহও দিত না। উলটে আমার কবিতা লেখাটা বাপ-ছেলের রসিকতার বিষয় ছিল। এখন ভাবি, দীর্ঘ বাইশ বছর যে লোকটার সঙ্গে কাটালাম সে লোকটা একদিনের জন্যও জানতে চাইল না, আমি কেমন কবিতা লিখি! একবারও কবিতা শুনতে চাইল না!"
তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "তাছাড়া পরে আর কবিতা লিখতে পারলাম কই! সংসারেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ঘর সামলাব না কাব্য করব?"
"কিন্তু সে রাতে তো আপনি কবিতা শুনিয়েছিলেন। পার্টিতে সবাই আপনার কবিতার প্রশংসা করেছিল। তাই না?"
অন্যমনস্তভাবেই মৃদু হাসলেন বিদিশা, "হ্যাঁ। বহুদিন পরে কবিতার খাতাটা ঝেড়েঝুড়ে বের করেছিলাম। আমার আলমারির এককোণেই পড়ে ছিল। কি মনে হল, বের করে ফেললাম। বহুদিন পরে খাতাটায় চোখ বোলাতে বোলাতে মনে হচ্ছিল নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। যে মানুষটা নীরব সব কিছু সহ্য করে যায়, চুপচাপ সংসার করে, ঠিক তারই অন্তরের অন্য একটা রূপ লুকিয়ে আছে ওই খাতায়। তার আসল সত্তাটা কখন যেন নিজের অজান্তেই একের পর এক শব্দ সাজিয়ে নিজের কথা বলে গেছে। সে কথা অন্য কারওর নয়। সে কথা আমার। বলা ভাল, খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমি আমার আমিটাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম! যে কারওর স্ত্রী নয়, কারওর মা নয়, মালকিন নয়... সে নিছক আমি!"
"তারপর?"
"তারপর আর কী?" তিনি সকৌতুকে বললেন, "পার্টিতে নিজেই সাহস করে কবিতা পড়লাম। সবাই খুব প্রশংসা করল! উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আমার স্বামীর এক প্রাক্তন কোলিগ তো বলেই বসলেন, 'বউদি! এসব কবিতা খাতাবন্দি করে রাখার জন্য নয়! পাবলিশ করে ফেলুন।' খুব আনন্দ হল। মনে হল, তক্ষুনি সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে ফের কবিতা লিখতে বসে যাই। দুনিয়া গোল্লায় যাক—শুধু আমি আর আমার কবিতার খাতাই সত্য! ফিলিংটা কেমন বলে তো? নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো।" বিদিশা আপনমনেই আবৃত্তি করলেন, "আজি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,/ কেমনে পশিল গুহার আঁধারে/ প্রভাত-পাখির গান।/ না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়ে উঠিল প্রাণ।"
ঋতিকাও বিড়বিড় করে বলে, " হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়/ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,/ বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়/ কোথায় কারার দ্বার।/ কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,/ চারি দিকে তার বাঁধন কেন?/ ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙ রে বাঁধন,/ সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন,/ লহরীর পরে লহরী তুলিয়া/ আঘাতের পরে আঘাত কর।..."
বিদিশা নীরব দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার দৃষ্টিতে ম্লান বেদনা ঘনীভূত হয়ে আসছে। চোখটাও একটু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। তিনি সজোরে শ্বাস টানলেন। বড় বেদনার জায়গায় আঙুল রেখেছে মেয়েটা। এখন ভয় হয়, হয়তো আস্তে আস্তে হৃদয়ের গোপন কথাটাও জেনে ফেলবে সে।
"তারপর?"
"তারপর আর কী?" তিনি সকৌতুকে হেসে উঠলেন, "কবি হতে চেয়েছিলাম। হয়ে গেলাম খুনি। মজার ব্যাপার নয়?"
বিদিশা হাসছেন বটে, কিন্তু তার চোখ ছলছল করে উঠল। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঋতিকা।
"আপনি বলবেন না। তাই না?"
বিদিশা ঘাড় নাড়লেন।
"কেন?"
তিনি মুখ তুলে তাকালেন, "কারণ তুমি বিশ্বাস করবে না।"

"কেন করব না?" সে দৃঢ়স্বরে বলে, "বলেই দেখুন না।"
"না।" বিদিশার কণ্ঠে জেদ ফুটে ওঠে, "আমায় বিরক্ত করো না। আমি পারব না।"

"বেশ।" ঋতিকা হাল ছেড়ে দেয়, "শুধু এইটুকু বলুন যে এই দুর্ঘটনার পিছনে কি কবিতার কোনওরকম ভূমিকা আছে?"
বিদিশা মৃদু হাসলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, "পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো! বুঝলে?"

৬

নিজের সংকীর্ণ তক্তপোষে শুয়ে চোখ বুঁজলেন একশো বারো নম্বর কয়েদি, তথা বিদিশা সেন! তার বোঁজা চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছিল।
সত্যি, কাউকে কি বলা যায়? নিজের কথা বলতে তো ইচ্ছে করে। কাউকে বিশ্বাস করে সবকিছু উগরে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী বিশ্বাস করবে? কেউ বিশ্বাস করে না। তার ডিফেন্স কাউন্সিলরও যে কথা বিশ্বাস করেননি, সে কথা অন্য কেউ বিশ্বাস করবে কি করে?
আজও সেদিনটার কথা মনে পড়ে। কর্তার বিরাট অ্যাচিভমেন্টের খবরে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন তিনি। কাবাব থেকে শুরু করে

তার বোঁজা চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছিল। সত্যি, কাউকে কি কখনও বলা যায়?

বিরিয়ানি পর্যন্ত সব নিজের হাতে রেঁধেছিলেন। পার্টির সমস্ত ব্যবস্থাপনা নিজেই করেছিলেন। ইচ্ছে করলেই গোটা পার্টিটা ছেড়ে দেওয়া যেত কোনও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির হাতে। কিন্তু সে আয়োজনে জাঁকজমক থাকলেও আন্তরিকতা থাকে না। তাই একা হাতে সবকিছু সামলেছেন! অতিথিদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখেননি। সব দিক দিয়েই নিখুঁত ছিল পার্টি।
একটু রাত হতেই সরগরম হয়ে উঠল অনুষ্ঠান। অতিথিরা খাবার-পানীয়ের সঙ্গে বিনোদনও খুঁজছিলেন। কর্তা বেসুরো গলায় গোটা কয়েক কিশোরকুমারের গান গাইলেন। খানিকটা গাইলেন, খানিকটা ভুলে গেলেন! কখনও হুঁ হুঁ করে কখনও 'নি... নি... না... না' করে ভুলে যাওয়া কথাগুলো ম্যানেজ দিলেন! কখনও নিজেরই বেসুরো গানে হো হো করে হেসে উঠলেন। পার্টির স্পেশ্যাল গেস্ট মিঃ ব্যানার্জি পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, "মিঃ সেন,.... শশীকান্ত নয়, একা আপনিই আসর মাটি করার জন্য যথেষ্ট! বেসুরো গান আর সহ্য হচ্ছে না। মিসেস সেন, আপনি গান জানেন?"
বিদিশা লাজুক ভাবে মাথা নাড়লেন, "না, আমি গান জানি না।"
"তবে? নাচ?"
"নাঃ।"
"তবে?"
তিনি লাজুক ভঙ্গিতে জানালেন, "একসময় কবিতা লিখতাম...।"
"ক-বি-তা!" মিঃ ব্যানার্জি বিস্মিত ও অভিভূত, "আপনি কবি?"
"না। ঠিক কবি নই।" লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, "ওই শখ.... আর কি।"
"হয়ে যাক... হয়ে যাক।" মিঃ ব্যানাজির সঙ্গে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ গলা মেলালেন, "এরশা-দ... এরশা—দ।"
তারপর? তারপরের মুহূর্তগুলো স্বপ্নের মতো মনে হয় তার। প্রথমদিকে নার্ভাস কাঁপা কাঁপা গলায় কবিতা পাঠ শুরু করলেন। শ্রোতারা স্তম্ভিত! ধ্বনি উঠল, "এনকোর... এনকোর!" তারপর একের পর এক... একের পর এক...! শ্রোতাদের তৃষ্ণা যেন মেটে না! উচ্ছ্বসিত হাততালিতে ভরে উঠেছিল বিদিশার সন্ধেটা! মনে হচ্ছিল, যেন পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে গোটা ঘরে! নিজেই বুঁদ হয়ে যাচ্ছিলেন নিজের মধ্যে! আনন্দে বুক ভরে উঠছিল। বিস্ময়ে, নিজেকে আবিষ্কার করার রোমাঞ্চে তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল!
"এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"
পার্টির শেষে মিঃ ব্যানার্জি এগিয়ে এসেছিলেন ওর দিকে। সবার অভিনন্দন পেয়ে তখন রক্তিম মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বিদিশা। মিঃ ব্যানার্জি নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, "কবিতাগুলোকে এভাবে এতদিন ধরে অযত্নে কেন ফেলে রেখেছিলেন সে প্রশ্ন করছি না। বাট, ইউ মাস্ট পাবলিশ ইট। কখনও মনে হলে যোগাযোগ করবেন। আমার জানাশোনা ভাল পাবলিশার আছে।"
লজ্জায় 'থ্যাঙ্কস' শব্দটা উচ্চারণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন বিদিশা। ঢোঁক গিলে কোনওমতে মাথা নেড়েছিলেন। মানুষ যখন আচমকা আবিষ্কার করে ফেলে, একটা অজানা দরজা তার সামনে আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে তখন সে নিজের মোহেই নিজে ডুবে থাকে। বিদিশাও তেমনই একটা আচ্ছন্নতায় ডুবে যাচ্ছিলেন! মনে হচ্ছিল, আজ একটা নতুন বিদিশার জন্ম হয়েছে। ওই তো, একটু দূরেই মুক্তির পথ! একটু এগোলেই মুক্তি পেয়ে যাবেন।
ভরপুর আনন্দে সেদিন রাতে কবিতার খাতাটা বহুদিন পরে ফের খুলে বসলেন তিনি। শব্দেরা তখন বুকের অভ্যন্তর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে ছন্দের গন্ধ! অন্ত্যমিলগুলো যেন তার প্রতীক্ষাতেই এতদিন পথ চেয়ে বসেছিল। আজ অতি আপনজনকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। শুনতে পাচ্ছেন, বাবা আর ছেলে মিলে তার কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি মারছে। বিদিশা মৃদু হেসে এড়িয়ে গেলেন। অনেকদিন পরে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তার ভিতরের আসল মানুষটা আজ মুক্ত হয়েছে। আজ আর কারওর কটু কথা তার কানে ঢুকবে না! কবিতার ভিতরেই বুঁদ হয়েছিলেন তিনি, সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না। আচমকা খেয়াল হল গালের ওপর একটা উষ্ণ স্পর্শে! কর্তা এসে তার গালে হাত রেখেছেন। তার চোখের দৃষ্টিতে কামনা উপচে পড়ছে! আঙুলের ছোঁয়াতে রমণের ইচ্ছা স্পষ্ট।
আস্তে আস্তে বললেন বিদিশা, "আজ নয় প্লিজ। আজ আমি খুব টায়ার্ড।"
"কিন্তু আমার যে ইচ্ছে করছে।" পুরুষটি বললেন, "কতদিন আমরা ভালবাসি না। প্লিজ লেট মি লাভ ইউ!"
"আজ না।" তিনি প্রবল অনিচ্ছায় বলেন, "আই নো, ইউ লাভ মি। অ্যান্ড আই লাভ ইউ টু। লাভ মেকিংটা অন্যদিনের জন্য তোলা থাক না!"
"প্লিজ সোনা।" কর্তা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে খেতে বললেন, "ডোন্ট স্পয়েল মাই নাইট! কাম অন।"
"না। আমি টায়ার্ড!" লোকটাকে জোর করে সরিয়ে দিয়েছেন বিদিশা, "তাছাড়া আমি কাজ করছি। ডিস্টার্ব কোর না।"
প্রত্যাখ্যাত হয়ে বোধহয় মানুষটার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। সরে গিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, "কি এমন রাজকার্য করছ তুমি? কতগুলো ছাইপাঁশ কবিতা লিখছ! কয়েকটা লোক জাস্ট

ফালতু ফালতু হাততালি দিল, আর তুমিও বাড় খেয়ে নিজেকে এমিলি ব্রন্ট কিংবা এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ভাবতে শুরু করলে! কি দাম তোমার কবিতার! কে পড়বে! এই দ্যাখো...!"
বলতে বলতেই ছিনিয়ে নিয়েছেন তার কবিতার খাতাটা। বিদিশা বাধা দেবার চেষ্টা করতেই তাকে ঠেলে ফেললেন। আক্রোশে কবিতার খাতার পাতাগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি! বিদিশা চরম বেদনায় দেখলেন তার মুক্তির দরজা বন্ধ হয়ে গেল! 'আমি'টা একরাশ জঞ্জালে পরিণত হচ্ছে! নিজের সবকিছুই তো দিয়ে দিয়েছেন এই লোকটাকে! এত দেওয়ার পরেও এই প্রতিদান!
বিদিশার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল! বাইশ বছর ধরে ঘর করার পরেও এই লোকটার কাছে তার কোনও মূল্য নেই! তার নিজস্ব সত্তার, স্বপ্নের কোনও মূল্য নেই? কি চেয়েছিলেন তিনি? সংসারের হাঁফ ধরে যাওয়া রুটিন থেকে সামান্য সময়ের জন্য মুক্তি! নিজের সামনে একা বসার স্বাধীনতা! সেটুকুও কেড়ে নেবে! তিনি এতই মূল্যহীন!
এত রাগ তার কখনও হয়নি! মাথার মধ্যে একটা রাক্ষস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! চোখের সামনে দেখলেন লোকটা কবিতার খাতা শতছিন্ন করে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল! যেন তার স্বাধীনতাকেই অবহেলায় ফেলে দিল বাইরে! কি পেয়েছে এরা! সারাজীবন ওদের ইশারায় নাচতে হবে! নিজেকে নিংড়ে দিতে হবে! নিজস্ব কিছুই থাকতে দেবে না...! শুধুই দিয়ে যাবেন...! পাওয়ার কিছু নেই...? কিছু চাওয়ার অধিকার নেই...?
তারপরের কথা স্পষ্ট মনে নেই বিদিশার! অসম্ভব পৈশাচিক ক্রোধ তার চেতনাকে লুপ্ত করে দিয়েছিল। সম্বিত ফিরল ছেলের চিৎকারে! বিস্মিত, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখলেন বিছানায় তার স্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ! আর তার হাতে একটা রক্তাক্ত হাতুড়ি...!
দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিদিশা! তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন। কাউকে মারতে চাননি। অথচ মেরে ফেললেন! নাঃ এর জন্য কোনও অনুতাপ নেই। কোনও পাপবোধ নেই! একটাই দুঃখ, কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করলেও সহানুভূতি জানাবে না...!
কিন্তু ঋতিকা? ওই সাংবাদিক মেয়েটি? তিনি আপনমনেই মুচকি হাসেন। মেয়েটার দু'চোখে বন্দিত্ব দেখেছেন। সংসারে বদ্ধ জীব। মনে মনে নিশ্চয়ই সেও মুক্ত হতে চায়। নয়তো 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর এত লাইন থাকতে মেয়েটি ওই লাইনগুলোই আবৃত্তি করল কেন? তিনি বিড়বিড় করে ফের উচ্চারণ করলেন সেই শব্দগুলো—
"হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়/ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, / বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়/ কোথায় কারার দ্বারা।/ কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,/চারি দিকে তার বাঁধন কেন?/ ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙ রে বাঁধন,/ সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন,/ লহরীর পরে লহরী তুলিয়া/ আঘাতের পরে আঘাত কর।..."
বলতে বলতেই হেসে উঠল বিদিশা। নেই, এ সংসারে কারওরই মূল্য নেই! যতই ধমক চমক দেখাক, আসলে সকলেই মূল্যহীন! একদিন ও মেয়েটাও বুঝবে, "পুলিশ, তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো।" তার এক কানাকড়িও বেশি নয়!
তার মুখে রহস্যময় একটা হাসি ভেসে ওঠে। হাসতে হাসতে আপনমনেই বললেন, "যতই ধরো, যতই করো— আসলে সবাই একশো বারো..., আসলে সবাই একশো বারো... আমার মতোই একশো বারো...!"

অলংকরণ: শুভম দে সরকার